৭.১.১৭

২০২৫—

১) 'তাঁহার কাব্যে দুঃখের উল্লেখ থাকিলেও তিনি দুঃখবাদের কবি নহেন।' — কবিকঙ্কন মুকুন্দ সম্পর্কে এই মন্তব্যটির যথার্থ্য বিচার করো।

২০১১

অথবা, 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারন' এবং ফুল্লরার বারোমাস্যের দুঃখ — অংশ দুটির জন্য মুকুন্দকে দুঃখবাদী কবিরূপে অভিহিত করা যায় কিনা আলোচনা করো।

→ বাস্তব জীবনালেখ্যই হল সাহিত্য। জীবন পূর্নতা লাভ করে সুখ-দুঃখের সমন্বয়ে। তাই সাহিত্যে সুখবাদের সঙ্গে দুঃখবাদ সমানভাবে প্রাধান্য লাভ করে। দুঃখবাদ শিল্পীর একটি বিশেষ দার্শনিক মনোভাব। যিনি দুঃখবাদী কবি তাঁর কাছে সমগ্র পৃথিবী দুঃখময়, তাঁর কাছে সুখ হল আতিভাসিক সত্য, প্রান্ত বুদ্ধির ফসল। জাগতিক প্রেম ও জীবনকে সুখ বলে মনে করা হলেও তা দুঃখেরই চিরন্তন উৎস।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে 'দুঃখবাদী কবি' বলে অভিহিত করেন। তাঁর কাব্যে কবি ব্যক্তিগত জীবন ও সমকালীন বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্গতির চিত্রাঙ্কন করেছেন, কিন্তু দুঃখের জয়গান করেননি। তাঁর কাব্যে যদি নিছক দুঃখবর্ননা, গভীর নৈরাশ্য ও অতুলান্ত বেদনাবোধ থাকত তাহলে হয়তো তিনি মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে এতটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না। এ প্রসঙ্গে ড. ক্ষুদের চৌধুরির মন্তব্যটি স্মরনীয় —

"তাঁর বাস্তবতা দুঃখবাদীও না, সুখবাদীও না, তিনি হলেন অনন্ত জীবনরসের কবি।"

দুঃখবর্ননা ও দুঃখবাদ এক নয়। সুখ-দুঃখ পরস্পরের সহচর ও পরিপূরক। এই দুয়ের সংমিশ্রনে জীবন পূর্নতা পায়। যাঁরা কবিকঙ্কনকে 'দুঃখবাদী' কবি রূপে চিহ্নিত করেন, তাঁরা মঙ্গল কাব্যের যে অংশগুলিতে দুঃখবর্ননা রয়েছে তার ভিত্তিতে, সেগুলি হল —

১) গ্রন্থ উৎপত্তির কারন
২) পশুগনের দুঃখ-নিবেদন
৩) ফুল্লরার বারোমাস্যা

দুঃখের এইসব পৌনঃপুনিক ব্যবহার ও তাদের আত্যন্তিক বর্ননা কবিকে 'দুঃখবাদী' বলে প্রতীয়মান করে তুললেও তাঁর অন্তরায় বা চেতনায় এর কোনো অভিক্ষেপ গড়ে ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে নীচে কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

১) অনুৎপত্তির কারন : সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহল হর-পার্বতীর সম্বন্ধ। সমগ্র কাব্যের মধ্যে, উল্লেখিত অংশে কবির সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে পাই, কবি যেন অনেকটা কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে সমাজ-সংকট ও অত্যাচারের চিত্র বর্ননা করেছেন ——

"উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মন বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥"

কাব্যে আরও দুর্গতির চিত্র পাই ——

"অরকাল হইল কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥"

তাঁর এই ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখবোধ ও দুঃখের বর্ননা পাঠক হৃদয়ে স্পর্শ করে, কবি দেশ তথা সমাজের সময় যে দুর্গতির অংশভাগী হয়েছিল ——

"তৈল বিনা কৈলু স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।"

এপ্রসঙ্গে বলা যায় কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখবোধ ও তিক্ততাকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল দুঃখের বর্ননা করেছেন।

২) **পশুগণের দুঃখ-নিবেদন :** কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' শক্তিশালী ব্যাধ যুবক কালকেতুর আক্রমণে অরণ্যের ছোট থেকে বড় সকল পশুর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, তারা কালকেতুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দেবী অভয়ার নিকট তাদের দুঃখ নিবেদন করেছে। এখানে পশুদের উপর মানব-ব্যক্তিত্ব আরোপ এই অংশকে জীবন্ত করে তুলেছে। হাতি ক্রন্দন করে বলেছে —

"বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর,
লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য-ভিতর॥"

কিন্তু দেবী চণ্ডীর নিকট পশুদের দুঃখনিবেদনের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনদুঃখের অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু যখন ভালুকের জবানীতে কবি বলেছেন ——

"উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক,
নেউগী চৌধুরি নই না করি তালুক॥"

এখানে সমকালীন অত্যাচারে চিত্রই ফুটে উঠেছে।

অথবা বানরের দুঃখ-নিবেদনে আমরা দেখি ——

"কপি বলে শুন মা   আমরা মেতেক ছা
সবারে বেড়িল মহাবীর।
হেন মোর করে মন   হারায়ে জীবন-ধন
প্রাণ দিব গোবেলিয়া নীরে॥"

এই বর্ণনায় মন্ত্রনার চিত্র সুস্পষ্ট কিন্তু সেই সঙ্গে ভঙ্গিমা ও শব্দ প্রয়োগে পরিবেশিত হয়েছে কৌতুকরস।

৩) **ফুল্লরার বারোমাস্যা :** ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখ বর্ণনার যে মর্ম কবি দেখিয়েছেন তা দেখে কেউ কেউ তাঁকে দুঃখবাদী কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই দুঃখ বর্ণনার পশ্চাতে যে কারন রয়েছে তা হল ছদ্মবেশী অপরূপা রূপবতী ষোড়শী কন্যা দেবী চণ্ডীকে সতীন সন্দেহে বিতাড়িত করা, ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে তার দুঃখ অবস্থানের কথা বলেছে ——

"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
লম্বুকুন্তি হুস্তাতে সদাই বহে বান॥"

আবার দেখি ফুল্লরা ছদ্মবেশী দেবী চন্ডীকে তার সম্ভাবিত সপত্নীর মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য চৈত্র মাসে নিদারুন দুঃখ-কষ্টকে নিবেদন করেছে এইভাবে —

"অনল সমান পোড়ে চাইতের খরা।
চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥

— ——————

দুঃখকর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥"

মানবচরিত্র সম্পর্কে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন কবি ফুল্লরার এই দুঃখ কান্নার মধ্যে স্বামীর প্রতি তাহার অনুরাগকে ব্যক্ত করেছেন। ফুল্লরা তার দুঃখের সংসারেও সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকতে চায়। তাই সে দেবী চন্ডীকে কৌশলে বারোমাসের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়েছে। প্রসঙ্গে কোনো এক সমালোচক বলেছেন —

"কিন্তু এই চিত্র আঁকিবার সময়ে কবি যে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন অশ্রুমোচন করিতেছিলেন নয়, পরন্তু বিবদমান দুই নারীর মাঝখানে দাঁড়াইয়াও তাহাদের বিভিন্নভাব প্রতিবিম্বী মুখের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিলেন — এই দৃশ্য বোধহয় আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।"

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থগুলি ছাড়াও দেবখণ্ডে হরগৌরির দুঃখপূর্ণ দাম্পত্য জীবন, মদন ভস্মের পর রতি, আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর খেদ, ফুল্লরার খেদ প্রভৃতি অজস্র দুঃখবর্ণনার চিত্র পাই।

অবশেষে উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে 'তাঁহার কাব্যে দুঃখের উল্লেখ থাকিলেও তিনি দুঃখবাদের কবি নহেন।' এই মন্তব্যকে সমর্থন করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বলা যেতে পারে যে —

"মুকুন্দরাম দুঃখবর্ণনার কবি, কিন্তু দুঃখবাদী কবি নহেন। তাঁহার অভয়ামঙ্গলে পরম আশাবাদীর জীবনসঙ্গীত।

———

ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, দুঃখের ভিতর দিয়াই ইহার কোনও জীবনেরই অসমাপ্তি নির্দেশ করা হয় নাই, ইহাতে দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া সুখের আস্বাদন লাভের কথাও আছে।"

(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, সংস্করণ ১৯৭৫, পৃঃ ৫২৬)